আমি
অকৃতী অধম

অভীক ওসমান

ঐতিহ্য

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
তোমাদের মাঝেই বেঁচে থাকবো,

আরওয়াহ মানসুরা আরফা
আমাইরা মাহ্নুর
আদীন ইসফার
আরীজ ইসফার

সবিনয় নিবেদন

আত্মজীবনী বা মেমোয়ার্স সাধারণত মহামানব কিংবা মনীষীরা লিখে থাকেন। বিশ্বের সংগ্রামী নেতা, রাষ্ট্রজন বা অন্ত্যজ কোনো মানুষ যখন মহাকায় হয়ে ওঠেন তখন তিনি আত্মজীবনী লিখে থাকেন। আমার ব্যক্তিজীবনের অধ্যয়নের মুখ্য বিষয় হচ্ছে আত্মজীবনী। 'আমি অকৃতী অধম' গ্রন্থে যেটি বলতে চেয়েছি ৬০ দশকের চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও শঙ্খপাড়ের সংগ্রামী জনপদ থেকে একজন অরফ্যান নগরে এসে উনসত্তরের দেশকৃষ্টি আন্দোলন, একাত্তর পূর্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কথা। এই মুক্তিযুদ্ধই আমার জীবনের বড় সেলিব্রেশন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের কমিটমেন্ট ছিল সমাজে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা। এরই ধারাবাহিকতায় সাম্য-কাঙ্ক্ষার জন্য সেই একাত্তর থেকে বর্তমান সময় অবধি লড়ে যাচ্ছি। রাজনীতির কুমির আমাকে টেনে নিয়ে গেলেও ব্যক্তিজীবনে প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যেও কবিতা লেখা শুরু করি। পরবর্তীতে নাটক বিশেষ করে পথনাটক লিখি। এরপর লিখেছি গদ্য, অর্থনীতি, উন্নয়ন, রাজনীতি-দর্শন ও জীবনী। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একজন সফল সংগঠক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছি। পেশা হিসেবে কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার জীবনের মোড় অন্যরকমভাবে ঘুরে যেতে লাগল। চেম্বার বোর্ডের নির্দেশে নির্বাহী হিসেবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণ, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য বিদেশি প্রজেক্টসমূহে কাজ, ২২টি সিআইটিএফ আয়োজন, পিআর ও পাবলিকেশন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে নতুন মাত্রা যুক্ত করার চেষ্টা করেছি। চেম্বারকে তৃণমূল ব্যবসায়ীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার একটা সিন্সিয়ার এফোর্ট ছিল। চেম্বার থেকে অবসর গ্রহণের পরেও আমি কর্মিষ্ঠ থাকতে চেয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে আমি বিভিন্ন ট্রেডবডি ও জিপিএইচ ইস্পাত এর মতো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। আমার বিশ্বাসে প্রলেতারিয়াত কিন্তু বাহ্যিকভাবে বুর্জোয়াদের সাথে জীবনযাপন করতে হয়েছে। এটা খুব সিম্পল যে, একজন অরফ্যান ও মুদ্রাহীনকে অনওয়ার্ড স্ট্রাগলিংয়ের মধ্যে বড় হতে হয়েছে। আই এম সেলফ মেইড ম্যান। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ডম্যান

অ্যান্ড দ্য সি' এর নায়কের চরিত্রের চেয়েও বড় যুদ্ধ করতে হয়েছে। নিখিল সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবনে আমাকে অনেকে ডিফেইম করতে চেয়েছে। তেমন কোনো সাপোর্ট, প্রমোশন, প্রটেকশন পাইনি। কখনো কখনো মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে বেদনার্ত করে তুলেছে। ফিনিক্স পাখির মতো বারবার উঠে দাঁড়াতে হয়েছে।

আত্মজীবনীর মতো গ্রন্থ রচনা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো সহজ কথা সহজে বলা যায় না। এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা 'ঐতিহ্য' আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। আমার পরিবারের সকল সদস্য এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করেছে। অনেক ব্যক্তি ও গ্রন্থের তথ্যসূত্র আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তরুণ লেখক হামিদ উদ্দিনের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

পরম করুণাময়, পরম দয়াময় আমাদের সহায় হোন।

অভীক ওসমান
চট্টগ্রাম

সূচি

আমার জন্ম এবং শৈশব ১১
গোষ্ঠী বৃত্তান্ত ১৭
পিতৃস্মৃতি: একজন মানুষের মতো মানুষ ১৯
মাকে মনে পড়ে ২৩
সেকেন্ড মাদার মা'হাক্কা ৩০
মাতৃতুল্য বুবু ৩৩
অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ৩৭
পটিয়া নানাবাড়ি ৩৯
শেবন্দীর নানাবাড়ি মামাবাড়ি ৪১
পাগল বানাইল পাগল ৪৪
শৈশবের হাটবাজার ৪৭
সাধু শুক্লাম্বরের মেলা ৪৯
আমার রাখাল বন্ধুরা ৫২
ফেলে আসা কেশুয়া; গভীর নিশীথে লঞ্চের ভয়ংকর ভেঁপু ৫৩
৪০ নং মোমিন রোড ৫৫
কাজেম আলী হাইস্কুল ৫৬
নিউ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ৫৮
চট্টগ্রাম কলেজ ৬০
ঢাকা অধ্যায় ৭৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৭৬
হাটহাজারীর যাপিত জীবন ৮৩
গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ ৮৫
৪৯ নং ঘাটফরহাদবেগ ৮৭
টিউশনির বিনিময়ে খাদ্য ৯০
পলিটিক্স বিফোর লিবারেশন ওয়ার ৯১
বঙ্গবন্ধু-দর্শন ৯৩
আমার মুক্তিযুদ্ধ ৯৪
আমার ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ১০২
তিনদশকের সাহিত্য আন্দোলন ১০৫

নাটক হচ্ছে শিল্পের সোভিয়েত: গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়ের কথা (১৯৭৫-২০২৪) ১১৮
একনজরে গণায়ন-এর ৪০ বছর ১৩৩
চট্টল ইয়ুথ কয়ার এবং একুশে মেলা ১৩৭
প্রাক্সিস অধ্যয়ন সমিতি ও সমাজ অধ্যয়ন কেন্দ্র ১৪৪
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আড্ডা ১৪৬
আমার শিক্ষক জীবন ১৪৯
বরমা কলেজ : পশ্চিমবঙ্গের চিঠি ১৫২
চেম্বার অধ্যায় ১৫৫
শিপ ব্রেকিং অ্যাসোসিয়েশন ২২৮
মেট্রোপলিটন চেম্বার ২৩১
জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড ২৩৩
জনসংযোগবিদ ২৪১
জাসদ অধ্যায় ২৪৬
মাই লিডারস অ্যান্ড পিপল অব ইনস্পিরেশন ২৬২
আমার ব্যক্তিসত্তা ২৬৫
হস্তে রাজরেখা ২৬৯
চিরসাথী বই ২৭১
আমার লেখালেখি ২৭৪
প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ২৮১
আমার সিনেমা দেখা ২৮৪
বিদেশ সফর ২৮৮
টাইপিস্ট নেপালবাবু ৩০১
নো স্মোকিং বাট ক্যাফেইন এডিকশন ৩০২
নাপিত এবং হেয়ার সেলুন ৩০৪
হাশেম চত্বর ৩০৫
আমার পরিবার ৩০৫
পাঠকের জন্য খোলা চিঠি ৩১৬

আমার জন্ম এবং শৈশব

বায়ান্নর বাংলাভাষা আন্দোলন আবহাওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ইমিডিয়েট আফটার ১৯৫৫ কি ১৯৫৬ সালে আমার জন্ম। আমার পিতা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ছিলেন। তখন আমরা ১০ ভাই ৩ বোন ছিলাম। পরে দু-একজন মারা গেছেন। একজন স্কুলশিক্ষকের পক্ষে সন্তানদের জন্মদিন বা জন্মবছর লিখে রাখা তখন অত সম্ভব ছিল না। ১৯৫২ সালে ঢাকায় তখন প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম যাকে 'বাংলা কাশেম' বলা হয়, বাঙলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তিনি আমার ইউনিয়নের লোক। যুক্তফ্রন্টের এমপি হয়েছিলেন। তাছাড়া আমি বলি, একটা ফার্টাইল ল্যান্ডে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যাত্রামোহন সেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ইউনিয়ন আমার জন্ম-জনপদ। সেজন্য গর্ব করি। আমার কবিতায় লিখেছি জন্ম জনপদের কথা—

> "এই পথে হেঁটে গেছেন মওলানা মনিরুজ্জামান
> এই পথে হেঁটে গেছেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-যাত্রামোহন সেন,
> এই পথে হেঁটে গেছেন ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম
> সেই পথে হেঁটে গেছেন মুক্তিযোদ্ধা শ্রেষ্ঠ শহিদ মুরিদুল আলম।"

এগ্রোবেইজড ফ্যামিলি বা কৃষিভিত্তিক পরিবারের সন্তান আমি নই। আমার বাবা ফোরখ আহমদ চৌধুরী যিনি ফোরখ মাস্টার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পিটিপাশ করেছেন। বাবা লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি বরকল, বরমা, পাঠানদণ্ডি স্কুল, বাইনজুরি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। যার বেতন ছিল ৪৫ টাকা থেকে ৯০ টাকা।

আমাদের তখন খাওয়ার পানিটাও কিনতে হতো। গ্রামে থাকা অবস্থায় খাওয়ার পানিটা কিনতে হতো এজন্য যে, তখন এত টিউবওয়েল ছিল না। ছিল ২-৩টি ইউনিয়ন মিলে একটা। তেমনি আমাদের পানি সংগ্রহের

টিউবওয়েল ছিল পাশের ইউনিয়নে। আমার ইমিডিয়েট বড় বুলু আপুই পানি সংগ্রহের কাজটা করতেন। নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করাটা কষ্টকর ব্যাপার ছিল। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, রান্নার লাকড়ি—এটাও আমাদের কিনতে হতো। তখনকার সময়ে প্রত্যেকটি বিত্তবান ঘরে লাকড়ির জন্য আলাদা একটা ঘর থাকত। লাকড়ির উৎস ছিল তাদের পেছনের বাগান বা সামনের গাছগাছালি, বাগান-বাগিচা, যেখান থেকে তারা সোর্সিং করত। আরেকটা উৎস ছিল শঙ্খপাড়ে আমাদের যে বাড়ি—সেই নদীতে বর্ষার জলঢলে ওখান থেকে অনেকেই কাঠ সংগ্রহ করত। কিন্তু আমি রোগা কিশোর ছিলাম। সন্তরণের মধ্য দিয়ে বড় কাঠ বা এরকম সোর্সিং আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই কাঠও কিনতে হতো। 'অত্তবড়' বাড়িতে ইউনুস কোম্পানি কাঠ বিক্রি করত পিস করা লাকড়ির সাইজে।

আমার বাবা যে বেতন পেতেন সেটা আসত মনি-অর্ডারে এবং আমি আনতে যেতাম। আমাদের গ্রামে একটা কালিরহাট আছে। এই কালিরহাটেরই বিশ্বেশ্বর বাবু একাধারে একজন স্কুলশিক্ষক এবং খণ্ডকালীন পোস্টমাস্টার। তখন পোস্টমাস্টারের চাকরি এরকমই পার্টটাইম ছিল। আমি মনি-অর্ডার আনার জন্য হাটবারে যেতাম—তিনি যেখানে বসতেন। মনি-অর্ডার কখনো আসত, আবার কখনো আসত না। তখন শূন্য শূন্য মনে হতো— টাকা কখন আসবে, বাজার কখন হবে। তখন এক টাকা নিয়ে বাজারে গেলে ৭ পোয়া আমন ধানের লাল চাল পাওয়া যেত। আর সবজি আসত নানাবাড়ি থেকে। নানাবাড়ি ছিল একই ইউনিয়নে প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের বাড়ির পাশেই। আমার নানা বলতে দ্বিতীয় নানা।

আমাদের মূল যে রাস্তা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এর বড় রাস্তা—বলত কাঁচা সড়ক। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সময় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটি করা হয়েছিল। এটার বিভিন্ন অনুষঙ্গ আমার কবিতায় উঠে এসেছে। তারপর একটা সরুপথ দিয়ে আমাদের বাড়িতে যেতে হতো। সেই বাড়ির কথা মনে পড়লেই প্রথমেই যেটা মনে পড়ে—বর্ষার সময় প্রচুর কাদা ছিল। মানুষ একবার হেঁটে ঘরে গেলে বদনায় পা ধুয়ে উঠে যেতে হতো। আর বের হতো না। আর সুদিন মানে বসন্তকালে খুব বৃক্ষ সবুজ থাকত—জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যেভাবে প্রকৃতি আছে সেভাবে। ছোট ছোট কুসুমের পাতা, সুপারির ছোট ফল নিয়ে আমরা খেলতাম। মাটিতে গর্ত করে যে খেলাগুলো ছিল সেগুলো খেলতাম।

আমার এখনো মনে আছে আমাদের তখন ভূতের ভয় ছিল। বাড়ি থেকে কিছুদূর গেলেই রহমতউল্লাহ পুকুর পাড় ছিল এবং এরপরেই শঙ্খ নদীর

উপশাখা। শঙ্খ নদীর কথা আমাকে বলতেই হয়। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। প্রত্যেক কবির কাছে তার নিকটবর্তী নদী মায়ের দুধের মতো বলা হয়েছে, মাইকেল বলেছেন 'কপোতাক্ষ নদে'র কথা। আরো অনেকেই বলেছেন। শঙ্খ নদীর স্মৃতি আমার মনের মধ্যে রয়ে গেছে। নদী এবং পুকুরের মাঝখানে যে জায়গা ছিল সেখানে সাম্পানে আলকাতরা লাগানো হতো। তখন নদীপথেই বাণিজ্য ও পরিবহণের সবকিছুই ছিল। যাতায়াত, পণ্যবহন ও বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌপথ। নাইওরিরা নদীপথেই বাপের বাড়ি যেত, আমিও গিয়েছিলাম মা-খালা ও ভাবিদের সাথে। ওই সময় লবণের স্টক করা হতো সাম্পানে। যাত্রীরা বাজালিয়া যেত নদীপথেই। ওখান থেকে গোরিঙ্গাহাট। যেটা হচ্ছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় গঞ্জ। তৎকালীন বৃহত্তর পটিয়া, সাতকানিয়ার সকল কৃষিজাত রবিশস্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আসত। দুই পাড়ের মানুষরা গিয়ে ওখান থেকে পাইকারি দামেই পণ্য ক্রয় করত। ঘরের জন্য বাঁশ কিনত, ছন কিনত। আরেকটা মেথি বাঁশ ছিল যেটা রশি বা তারকাঁটা হিসেবে ব্যবহৃত হতো—সেটাও কিনত।

শঙ্খ নদী আলোকচিত্র : দৈনিক আজাদী

শঙ্খ নদীর উপশাখা আমাদের এদিকটায় ওপারে একটা চর ছিল, গবাদিপশুদের বিচরণস্থান ছিল ওই চরেই। ওই পাড়ে একটা বাড়ি ছিল যেটাতে আমরা যেতাম। মজার বিষয় আমরা সাঁতরে পার হতাম, এমনকি

বর্ষার সময় যখন খরস্রোতা ছিল তখনো। আমরা কেয়াঝাড়ের চারদিকে কাদার বাঁধ দিয়ে পানি সেচন করে অনেক চিংড়ি ধরতাম। আমরা বন্ধুরা মিলে নৌকা করে ঘুরে বেড়াতাম। নিজেদের কোনো নৌকা ছিল না, খালুর ছিল। সেই নৌকায় চড়ে আমরা বড় শঙ্খ নদীতেও যেতাম। আমাদের গ্রামের আরেকটু দূরেই ছিল সাতকানিয়ার খাগরিয়া পাহাড়। শৈশবের অনেক দূরের পাহাড় যেখানে আকাশ মিশেছে। সেই শৈশবে আমার মনে হতো আল্লাহ ওখানেই শেষ। খাগরিয়া পাহাড় আমার কাছে কী ভীষণ অন্যরকম মনে হতো ভাবলে অবাক লাগে। পরবর্তী জীবনে যখন রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের অমল পড়ি তখন ওটার সাথে মিলেছে।

সেসময় শিশু শ্রেণি ছিল, প্রথম শ্রেণিও ছিল। কিন্তু আমাদের চৌধুরী বাড়ির ছেলেদেরকে ক্লাস টুতে ভর্তি করাতে হতো। যার ফলে আমি যে জন্ম তারিখের কথা বলছি, সেই জন্ম তারিখটি বরকলের স্কুল থেকে হয়েছে, না শহরের স্কুল থেকে হয়েছে আমি জানি না।

যেদিন রোববার হতো আমার বাবা আমাদের পাশের যে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোনামিয়া, যিনি পরবর্তীতে এমপিএ, আমরা প্রতিদিন সেখানে যেতাম। ওরা এগ্রোবেইজড ফ্যামিলি। আমাদের নাশতা হিসেবে দিত পান্তাভাত আর মানকচু। কিন্তু রোববারে আমরা সল্টেজ বিস্কুট পেতাম। সেটা আমাদের জন্য স্পেশাল ছিল। আমি, সোনামিয়া চেয়ারম্যানের বড় মেয়ে হোসনে আরা এবং ফরিদ (মারা গেছে)। আমাদের তিনজনকে আমার বাবা পড়াতেন। আমার বাবা একইসাথে তাদের হাউজ টিউটর এবং চেয়ারম্যানের সচিব এবং এমপির সচিবের কাজও করেছে। তার হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল। বাবা রেশন তোলার জন্য নদীপথে সকালে পটিয়া সদর আসতেন খুব বড় একটা চওড়া ব্যাগ নিয়ে এবং তাকে সকালে উঠে সুজি রেঁধে দেওয়া হতো।

একবার কেন জানি মনে হতো তিনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। প্রাতে উঠেই আমার মনে হলো চট্টগ্রামের ভাষায় "আঁরে লই যাইবু ফঁল্লার"। কিন্তু উঠে দেখলাম আমাকে না নিয়ে চলে গেলেন এবং আমি নিজে নিজেই আছাড় খেলাম, ইমোশনাল হলাম। যাহোক তিনি রেশন তুলে পটিয়া থেকে আমাদের জন্য বড় বড় পেয়ারা আনতেন। কাঞ্চননগরের পেয়ারাগুলো এখনো একটা ব্র্যান্ড। সেই পেয়ারা আমরা পেতাম। তখন বৃহত্তর পটিয়া এক ছিল। পটিয়া একমাত্র মহকুমা ছিল যেটা ডিমোশন হয়েছে। এটা করেছেন কর্নেল সাহেব মানে সাবেক মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদ বীরবিক্রম।

শনিবারে খুব দুপুরে আমাদের বুক ধুকপুক করত আমার বাড়ির ভাবিরা (নিজের ভাবি না অবশ্য) তারা নারকেল তেল দিয়ে তৈরি হতো, অপেক্ষা করত শহরে জীবিকা উপার্জন করা ভাইয়েরা যাবে তাদের জন্য। সাথে একটা ইলিশ মাছ আর মালদহের দুটো বিশাল সাইজের আম নিয়ে। এরা আমাদের বাড়ির ভাই—তারা মূলত খুদে দোকানদার আর চাকুরে।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোকজনরা প্রথমে আসে লালদিঘি এলাকায়। সবাই জানে যে, আনোয়ারা বাঁশখালীকে একসময় বলা হতো মামলাবাজ। ওরা কী করত—খাদ্যসহ মোছা করে কোমরের সাথে বেঁধে লালদিঘি পাড়ের সামনে শুয়ে থাকত তারপর মামলা করত। দক্ষিণ চট্টগ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তখন লালদিঘি পাড়ে আসত হোটেলে উঠত না। পরে ওই এলাকায় কিছু বোর্ডিং গড়ে ওঠে এবং ওখানেই ওরা ভাসমান দোকানদার ছিল।

১৯৫৪ সালের মাহমুদুন্নবী চৌধুরী যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন এই যে লয়েল রোড নবীমার্কেট—এটি করেছেন প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম এবং আমার শ্বশুর আবদুল হালিম চৌধুরী। নবী মার্কেটে আমাদের নামে দোকানগুলো ছিল—এখনো আছে। ওখানে চৌধুরী স্টোরে বসে ১৯৭৮ সালে 'রাত ফেরার' আমার নাটকটা লিখেছিলাম।

আমাদের গোষ্ঠীর শহর থেকে যারা যেত তারা সহজেই নগরে চাকরিতে ফিরতে চাইত না। এরা খুব বাড়িপাগল মানুষ। আমি এমনকি দেখেছি বউয়ের শাড়িকে লুঙ্গির মতো পরতে, বউয়ের স্যান্ডেল পরতে, এটা এক ধরনের ফ্রয়েডীয় ব্যাপার। গ্রামে বউ ছেড়ে শহরে আসতে চাইত না। পিছুটান—গ্রামই ওদের আবেগের জায়গা। আবার এমনও ছিল যারা ব্যবসা বা চাকরি করত ওরা যে পয়সা পেত তা থেকে ঘরসংসার চালাতো এবং জমি কিনতে পারত। একাত্তরের পূর্বে যারা ব্যাংকে চাকরি করত, চাকরি করছে বা ব্যবসা করছে—ওরা সংসার চালিয়ে জমিজমাও কিনতে পারত। একটু বিত্তবান হলে ওরা টিনের ঘর বানাতো। এখন তো সব বিল্ডিং হয়ে গেছে।

১৯৬২ সালে আমি ক্লাস টুতে ভর্তি হই। ১৯৬৪ সালে পহেলা রমজান সেহরির সময় আমার বাবা মারা যায়। আমরা বাবাকে বলতাম 'বাজি'। এরমধ্যে আমি ক্লাস ফোর থেকে ফার্স্ট হয়ে ক্লাস ফাইভে উঠেছি। অত্যন্ত বেদনার সাথে বলছি। তখন আরেকজন হেডমাস্টার ছিল বিনোদ চক্রবর্তী। খুব ফরসা, হ্যান্ডসাম। ওনাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। কিন্তু তিনি ক্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুইতো ফার্স্ট হয়েছিস তোর বাবার প্রশ্ন দিয়ে। আমি খুব বেদনাহত হয়েছি ওনার এরকম সাম্প্রদায়িক কথা শুনে। তিনি

স্বদেশি ছিলেন কিন্তু তার মুখে সাম্প্রদায়িক কথা শুনে আহত হয়েছি। আমার পিতা আমাদের কখনোই সাম্প্রদায়িকতা শেখাননি।

আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার মা আমাদের এফোর্ট করতে পারছিলেন না। বাবা মারা যাওয়ার আগে মাকে বলে তোমাকে এক 'উইজ্জে ছানা' দিয়ে যাচ্ছি আরকিছু দিয়ে যাচ্ছি না। ১৯৬৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারির খুব গভীর রাতে ঘুম ঘুম চোখে আমি আমার মা, আমার গ্রাম, আমার শঙ্খ নদী, আমার শৈশবের সবকিছু ফেলে ছোট ভাই এমরান চৌধুরীসহ শহরে চলে আসি লেখাপড়া করার জন্য। কিন্তু আমরা কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলাম না শহরকে। মার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল ছিল।

আমার ভিটেবাড়ি

আমার টিচার পিতার ভিটেটা খুব ছোট ছিল। আমাদের বাড়ির সামনে একটা বাগান ছিল—যেখানে নারিশ শাক, একটা দুটো সুপারি গাছ ছিল, একটা দুটো আমগাছও ছিল। আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে, আমাদের একটা আতাগাছ ছিল—সেখান থেকে ন্যাচারাল অর্গানিক আতা আমরা পেতাম। ছড়ার মতো 'আতাগাছে তোতাপাখি' বসতেও দেখেছি। একটা বরইগাছ ছিল যেটা অনেকদিন বেঁচে ছিল। আমাদের একটা ছনের গুদামঘর এবং একটা বারান্দা ছিল, একটা 'অঁলা ঘর' (রান্নাঘর) ছিল। মায়ের 'কুরোর আঁড়াইল' (মুরগির ঘর) ছিল। পেছনে একটা পুকুর ছিল। এখন পর্যন্ত সেই ছোট পরিধির পাকাঘরের ভিটেবাড়িতে আমরা বসবাস করি।

গোষ্ঠী বৃত্তান্ত

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে একরকম একটা প্রবাদগল্প রয়েছে যে মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট এলাকার এক রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ। আমাদের পূর্বপুরুষের কোনো এক সুন্দরী রমণী রাজা বা রাজবাহাদুরকে পাটশাক রন্ধন করে মুগ্ধ করেছিলেন। পরে তিনি তাকে বিয়ে করতে চান। এই প্রেক্ষাপটে রোষানলে পড়ে তারা নদীপথে পালিয়ে আসেন। এই সূত্র ধরে আমাদের পূর্বপুরুষ কিছু চকরিয়ায় রয়ে যায়, কিছু বাঁশখালীতে আসে—মরহুম সুলতান এমপিরা এবং কিছু চন্দনাইশে চলে আসে। আমাদের গোষ্ঠীকে কেন জানি না 'হরজ্জার গোষ্ঠী' বলে। আমাদের রক্তীয় উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, পূর্ব পাড়া, পশ্চিম পাড়া ছিল। পাকিস্তান আমলে এমন অবস্থা ছিল যে আমাদের ৪-৫ বাড়ির ভোটেই ইউপির ওয়ার্ড মেম্বার হয়ে যেত।

আমাদের গোষ্ঠীর পূর্ব পাড়ায় ছিল নাদেরুজ্জামান চৌধুরীর বংশধর। নাদেরুজ্জামান এর দুই পুত্র—একজন ইকবাল আহমদ, অন্যজন আমানত জামান। তাদের ৫ বোন ছিল। বোনদের এক একজনের বিয়ে হয়েছিল পটিয়া, গাছবাড়িয়া, সাতবাড়িয়া, কানাইমাদারি শেখ চাঁদ পাড়া ও কেশুয়ায়। এরা সবাই বিত্তশালী ছিল। তাদের এক বোন হচ্ছে আমার নানির মা। আমানত জামানের ওয়ারিশদের মধ্যে ছিল আবদুল মালেক, আবদুল মাজেদ, আবদুল মোনাফ, আবদুল কুদ্দুস এবং আঞ্জুমান আরা। ইকবাল আহমেদের ওয়ারিশান ছিল আবুল হাশেম চৌধুরী, আবদুল মোতালেব চৌধুরী এবং সালেমা বেগম।

শঙ্খ নদীর তীরবর্তী আমাদের দক্ষিণ পাড়া ছিল রমজান আলী চৌধুরীর ওয়ারিশান। তার বড় ছেলে আবদুল মাবুদ চৌধুরী, মেজো ছেলে আবদুল লতিফ চৌধুরী, তৃতীয় ছেলে নুরুল আলম চৌধুরী, চতুর্থ ছেলে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী এবং পঞ্চম ও ছোট ছেলে আবদুল আলীম চৌধুরী। আবদুল

মাবুদ চৌধুরী চট্টগ্রাম পোর্টের সুপার পেশকার এবং গ্রাম সরকারের প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় ছেলে আবদুল লতিফ চৌধুরী ব্যবসা করতেন। তৃতীয় ছেলে নুরুল আলম চৌধুরী আকিয়াবে থাকতেন এবং ওখানে শাদি করেছেন। চতুর্থ ছেলে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী টিনের হাটে হাসিল তুলতেন এবং লঞ্চের এজেন্ট ছিলেন। তাদের ছোট ছেলে ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি আবদুল আলীম চৌধুরী আমার শ্বশুর।

পশ্চিমের দিকে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর শিষ্য বিশিষ্ট আলেম অলি আহমদ চৌধুরীদের বাড়ি। আমার মায়ের নানাবাড়ি। অলি আহমদ চৌধুরী বিয়ে করেছিলেন আমাদের পূর্ব বাড়ি থেকে অর্থাৎ আমার নানির মাকে। অলি আহমদ চৌধুরী সেসময়কার প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তারাও তিন-চার ভাইবোন ছিলেন। ওনাদের পাশের বাড়ি হচ্ছে নাদেরুজ্জামান চৌধুরীর বাড়ি। তাদের ছেলে ছিল ইউসুফ চৌধুরী, আইয়ুব চৌধুরী, ইয়াকুব চৌধুরী, আবুল কালাম চৌধুরী প্রমুখ।

আর উত্তর পাড়া হচ্ছে আমাদের বাড়ি। আমার বাবারা ৩ ভাই ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ফোরখ আহমদ চৌধুরী এবং খুইল্লা চাচা। আমার জেঠাতো ভাই আনোয়ারুল হক চৌধুরী, আজিমুদ্দীন চৌধুরী, ফজল করিম চৌধুরী। তাদের এক বোনকে খরনায় বিয়ে দিয়েছেন।

আরেকজন হচ্ছে ওয়াহিদুল আলম চৌধুরী। তাদের পরিবারে ছিল ফেরদৌস আলম, আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী এবং এক বোন হামিদা বেগম।

আমাদের অনেক আত্মীয় ছিল বৃহত্তর পটিয়ার বিভিন্ন জায়গায়। জামিরজুরি মুফতি নুরুল হকের বাড়ি ছিল আমার শাশুড়ির নানাবাড়ি। আমার নানা শ্বশুর ছিলেন আবদুল খালেক চৌধুরী। আমার নানি শাশুড়ি ছিলেন তার দ্বিতীয়া স্ত্রী।

আমার দুজন ফুফু (আমার বাবার সৎ-বোন) আমেনা খাতুনের বিয়ে হয়েছে প্রতিবেশী ইউনিয়ন বরকলের চন চৌধুরীর বাড়ি। আমার ফুফা বেশ নামকরা লোক ছিলেন। তার ছেলে ধইন্ন্যা ফকির মিনি পির হিসেবে আবির্ভূত হন। পটিয়া চক্রশালায় আবদুল গণি চৌধুরীর সাথে আমার আরেক কচুনি ফুফুর বিয়ে হয়। তিনি বোরকা পরতেন এবং সেসময় তাকে বুট সু পরতেও দেখেছি।

পিতৃস্মৃতি: একজন মানুষের মতো মানুষ

আমার পিতা, আমার পরম প্রিয় পুরুষ—ফোরখ আহমদ চৌধুরী প্রকাশ ফোরক মাস্টার। অসাধারণ কেউ, কোনো বড় মাপের কেউ ছিলেন না। কেউ তাকে মনে রাখেনি, আমারাও কি রেখেছি? মৃত্যুর কঘণ্টা পর যেন মানুষ মানুষকে ভুলে যায়। অথচ তাঁর অনেক ছাত্র আজ সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তার পূর্ণাবয়ব চেহারাটাও রিকালেক্ট করতে পারছি না। কখনো মনে হয় আরজ আলী মাতুব্বর-এর চেহারা। কখনো মনে হয় পুরনো আজাদী অফিসের কাছে বসা এক রুগ্‌ণ ভিক্ষুকের প্রতিকৃতি। হ্যাঁ, রুগ্‌ণ, দীনহীন, মাঝারি হাইটের স্মল পক্সের কয়েকটা দাগ সাদা-কালো দাড়ির ফরোক মাস্টার ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে। ছাতা হাতে এখনো বরকল-বরমা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে স্কুলে যাচ্ছেন। একজন সৎ, দৃঢ়চেতা কিন্তু নরম আবেগের মানুষ। সারাজীবন মানুষকে পড়াতে ভালোবাসতেন, সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতেন। সেই শৈশবে তার হাতের দু-একটা লেখা সংরক্ষণ করেছিলাম। জীবনসংগ্রামের হারিকেন-টানে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। তিনি নিরীহ কিন্তু নির্লোভ ছিলেন। পুস্তকের ভাষায় অসাম্প্রদায়িক নয়, সত্যিকার অর্থে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রসর ছিলেন। সেই '৪৭-এ এক মুসলিম স্কুলশিক্ষকের পক্ষে তা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

১৯১৫ সালে পটিয়া থানার বরমা ইউনিয়নের কেশুয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন চাঁন মিয়া মুন্সী। আমাদের বংশের সম্পর্কে একটা গল্প পাওয়া যায়— আমাদের এক পুরঃনারী নাফ নদী তীরবর্তী জনপদের এক নবাবের কোপানলে পড়লে, তার স্বামী বড় বড় নৌকা ভাড়া করে ভাটির দিকে পালিয়ে আসেন। তারা চকরিয়া চন্দনাইশ বাঁশখালী অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসত শুরু করে। তরুণ বয়সে ফোরক মাস্টার সংসার বিরাগী